Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.10-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রামায়ণে বেদবিহিত নৈতিকতার পর্যালোচনা

অগ্নিশিখা বন্দ্যোপাধ্যায়
গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
This paper explores the epic Ramayana in which the Vedas embodies the sacred knowledge and wisdom that guide the characters through their moral and ethical dilemmas. As a divine authority, Veda represents the principles of dharma (righteousness) and duty, which are central to the narrative. Throughout the epic, these ethical duties include imparting knowledge to key figures, helping them navigate their challenges with virtue and integrity. These duties serves as a source of guidance, emphasizing the importance of honor, loyalty, and sacrifice. The paper illustrates how adherence to Vedic principles shapes the destinies of the characters and how important it was to observe these duties in any circumstances. By encapsulating the ideals of duty, righteousness, and devotion, Ramayana not only influences individual choices but also reinforces the importance of executing ethical obligations. Through its teachings, these ethical duties fosters a deep understanding of the interconnectedness of all beings, urging the protagonists to uphold their responsibilities while remaining true to their ethical foundations. In this way, Vaidika ethics in Ramayana extend beyond mere instruction, shaping the moral landscape of the epic and ensuring the continuation of its timeless wisdom.

Keywords: Ramayana, Ethics, Vaidika Ethics, Dharma, Environmental ethics.

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে রচিত মহাকাব্য 'রামায়ণ' তার রচনাকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ভারতের জনমানসে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই মহাকাব্যটিকে ইতিহাসের পদমর্যাদা দেওয়া হয়। 'ধর্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশ সমন্বিতম। পূর্ববৃত্তম কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে।'- অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষ, জীবনের পূর্ণতা সাধনের চতুর্বর্গ বিষয়ে উপদেশ সমন্বিত অতীতের ঘটনাবলীর কাহিনি হল ইতিহাস। রামায়ণের কাহিনি যে নৈতিকতার পাঠ দিয়েছে তা সাধারণ মানুষের কাছে আদর্শের পরাকাষ্ঠা রূপেই বিবেচিত। বহু ভাষায় অনূদিত এই মহাকাব্যটি পৃথিবী জুড়ে নীতিবিদ পণ্ডিতজনকে কাহিনীর চরিত্রদের তাঁদের নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করতে আগ্রহী করে তুলেছে। একই চরিত্রকে বহু জন বহু আঙ্গিকে দেখে তার ধর্মাধর্ম নির্ণয় করতে চেয়েছেন। মহাকাব্যের ঘটনাবলীকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাদের কুশীলবদের নতুন রূপে সৃজন করে কবিতা, নাটক, উপন্যাস আদি অসংখ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের এক বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে রামায়ণ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং কাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র ভগবানরূপে উপাসিত হন। রামায়ণের নৈতিকতা বলতে সাধারণভাবে পিতামাতার প্রতি

সন্তানের কর্তব্য, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য, পতিব্রতা নারীর আদর্শ, প্রজারঞ্জক রাজার কথা এগুলিই আগে উঠে আসে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত এই মহাকাব্যের দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নীতিও জনসাধারণের কাছে সুপ্রচলিত। এই আদর্শগুলি ছাড়াও তৎকালীন সমাজে নৈতিকতা তথা পালনীয় কর্তব্য বলতে কী বোঝানো হত তার প্রভূত উদাহরণ দেখা যায় রামায়ণে। এই গবেষণাপত্রটিতে সমীক্ষা করে দেখবো রামায়ণের পটভূমিকায় শাস্ত্রসম্মত তথা বেদোক্ত কর্তব্যগুলি কীভাবে পালন করা হয়েছে।

বেদবিহিত কর্মের মধ্যে নিত্যকর্ম হল সেইসব কর্তব্য যেগুলির প্রতিদিন অনুশীলন প্রয়োজন; কোনো বিশেষ ফললাভের উদ্দেশ্যে এই কর্ম কৃত হয় না কিন্তু নিয়মিত নিষ্ঠাভরে এর পালন না হলে তা পাপের সাধন। এছাড়া আর দুই প্রকার কর্ম হল নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্য কর্ম। জীবনের কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র তথা নিমিত্ত করে যে কর্তব্যগুলি পালন করার কথা বেদে নির্দেশিত হয়েছে – সেগুলি নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক কর্ম পালন করলে তা কর্তার পক্ষে মঙ্গলকারক। কাম্যকর্ম হল সেইসব কর্মাদি যেগুলি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পালন করা হয়। রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের শুরুতেই দেখবো একটি কাম্যকর্মের আয়োজন চলছে – তা হল পুত্রীয়েষ্টি যজ্ঞ। রাজা দশরথ পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্ঞের ঋত্বিক হিসেবে বহু সমারোহে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অঙ্গরাজ্য থেকে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। এক বছর যাবৎ এই যজ্ঞের আয়োজন করে, সরযূ নদীর তীরে সাড়ম্বরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করা হল। একবছর পর যে অশ্ব অর্থাৎ ঘোড়াটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো সে ফিরে এলে যজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞের হোতা-উদ্গাতা প্রমুখ ঋষিরা যজ্ঞের আগুনে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করলেন এবং অনেক পশু পাখি জলচর প্রাণী সেই দেবতাদের উদ্দেশ্যেই বলি দিলেন। এই যে যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি এবং পশুবলি রীতি এটি বৈদিক – বিশেষত ঋক বৈদিক সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করে তাদের প্রীতিকামনায় যজ্ঞ সেইসময়ের উচিত কর্তব্য ছিল, এবং বিভিন্ন যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ একটি গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ। এর পরে সেই যজ্ঞে রাজার প্রধানা স্ত্রী কৌশল্যা নিজে হাঁড়িকাঠে বদ্ধ থাকা একটি উৎকৃষ্ট প্রজাতির ঘোড়াকে তিন খড়্গের আঘাতে বধ করেন। সেই ঘোড়ারই মেদ নিয়ে এবং পরে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে যথাশাস্ত্র হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হল। রামেদের জন্মের এগারোদিন পরে কূলপুরোহিত বশিষ্ঠ তাদের নামকরণ করেন, এই নামকরণ বেদবিহিত ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে একটি। নির্দিষ্ট দিনে তথা জন্মের দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা একশোতম দিনে শিশুকে স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে নির্বাচিত নামটি নির্দিষ্ট করা হয়। এটি একটি নৈমিত্তিক কর্ম অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ঘটনার নিমিত্তে এই কর্ম কৃত হয় যা কর্মকর্তার পক্ষে মঙ্গলকারক। আবার রাম-সীতার বিবাহের পূর্বে রাজা জনক তাদের গোদান করতে ও পিতৃকার্য তথা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। দশরথ ছেলেদের বিবাহের উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে চার পুত্রের জন্য চার লক্ষ সবৎসা গাভীদান করেন। রাম লক্ষ্মণ চার ভাইকেও দেখি তাঁরা বিবাহের পূর্বে কৌতুকমঙ্গল নামের মঙ্গলাচরণ করেন। বিবাহ ষোড়শ সংস্কারের অন্যতম; রামেদের চার ভাইয়ের বিয়েতে যথাবিধি অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কন্যা সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম, সপ্তপদী গমন সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরে অযোধ্যায় গিয়েও নতুন বধূদের বরণের পর মঙ্গলাচার এবং হোম সম্পন্ন করা হয়।

মানুষের জীবনের বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই যে নৈমিত্তিক কর্মগুলি যা আধুনিক জীবনে আমরা অনুষ্ঠান রূপেই দেখবো, রামায়ণের সমসাময়িক সমাজ জীবনে বেদ বিহিত কর্ম হিসেবেই অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। সেই জন্য রামায়ণের ছত্রে ছত্রে বারবার এই কর্তব্যগুলির বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যান করা হয়েছে।

নিত্যকর্মাদিও ঠিক ততটাই প্রাধান্য পেয়েছে, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হতে পারে নিত্যকর্মের গুরুত্বই বোধহয় বেশি। সন্ধ্যাবন্দনা, পিতৃতর্পণ, হোম প্রভৃতি এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে বিশ্বামিত্র যখন কিশোর বয়েসের রাম ও লক্ষ্মণকে তাঁর সাথে বনে নিয়ে যান, তখনও বিশ্বামিত্রের দশদিনব্যাপী যজ্ঞ রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করতে সদাতৎপর রাম-লক্ষণ নিত্যকৃত্যাদি করতে ভোলেন নি। অরণ্যকাণ্ডের একদম শুরুতেই যেখানে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন সেখানে অরণ্যনিবাসী বৃদ্ধ মুনিদের আশ্রমের বিস্তারিত ও সুললিত বর্ণনা রয়েছে। মুনিদের আশ্রম বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহে শোভিত, যজ্ঞের নানা উপকরন, সেখানে সঞ্চিত রয়েছে এবং হোম ও বেদমন্ত্র পাঠ চলছে। দেবতাদের প্রতি মানুষের যে ঋণ তার পরিশোধ কল্পে অর্থাৎ মানবজীবনে সুখ সমৃদ্ধিপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে সারাজীবন মানুষকে অগ্নিহোত্র যাগ করতে হয়, এটি একটি নিত্যকর্ম। নিত্যকর্মের পালন একদিকে যেমন বৈদিক অনুশাসনের প্রতি তৎকালীন সামাজিক মানুষের আস্থার পরিচায়ক, অপরদিকে এই আস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখবো মানবচরিত্রের কৃতজ্ঞতা গুণটির প্রতিফলন। অন্যান্য প্রাণীদের সাথে আমাদের পার্থক্য এই যে পশুপাখিরা যেমন প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ হলেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, আমরা মানুষেরা তা হই না। সমাজ যত আধুনিক হয়েছে, বিশেষত বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যেখানে ধনতন্ত্রই সমাজের নিয়ামক – মানুষের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিছু চেয়ে তার প্রাপ্তি হলেও সন্তুষ্টি বা কৃতজ্ঞতার বোধ আমাদের সামান্যই। রামায়ণের সময়ে এই তপস্বীরা যে গভীর জঙ্গলে বাস করেও দেবঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে নিয়মিত হোম-যজ্ঞাদিতে রত রয়েছেন, যে হোম কোন কাম্যকর্ম নয় বরং প্রতিদিনের কর্তব্য, তা কিন্তু তাদের কৃতজ্ঞতাবোধেরই পরিচায়ক। প্রকৃতি থেকে যা প্রাপ্তি হচ্ছে তার জন্য সেই প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যেই নম্রভাবে নিষ্ঠা সহকারে জীবনের কিছুটা সময়, কিছু পরিমাণ পার্থিব বস্তুর নিবেদন বৈদিক নৈতিকতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

দেবঋণের প্রসঙ্গক্রমে রাজা দশরথের একটি উক্তি স্মরণ করি, যেখানে জেষ্ঠ্যপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন বলে সংকল্প করে তিনি রামকে বলছেন পঞ্চ ঋণ তথা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, বিপ্রঋণ এবং আত্মঋণ থেকে মুক্ত। তাই এক্ষণে রামকে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করা ব্যতীত তাঁর আর কোনো দায়িত্ব নেই। দেবঋণ থেকে মুক্তির উপায় তো আগেই বলা হয়েছে -যজ্ঞ। বাকি চারটি ঋণের পরিশোধনের জন্য যথাক্রমে অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, দান এবং বিষয়ভোগ কর্তব্য। গৃহস্থের পালনীয় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ তার স্বরূপও এমনই। দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ – এই পাঁচটি কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। দেব-পিতৃ-ব্রহ্ম যজ্ঞ দেব-পিতৃ ও ঋষিঋণ পরিশোধনের জন্যই কৃত হয়। নৃযজ্ঞ হল মানুষের সেবা এবং ভূতযজ্ঞ হল মনুষ্যেতর প্রাণীর সেবা। আমাদের নৃকেন্দ্রিক মানসিকতায় আমরা মনে করি প্রকৃতি শুধুমাত্র আমাদেরই প্রয়োজন সাধন করবে, অথচ মানুষের মত অন্যান্য প্রাণীরাও যে প্রকৃতিরই অংশ সেকথা আমাদের কাছে গৌণ। উন্নয়নের নামে সেই আদিম সময় থেকেই মানুষ বন কেটে বাসস্থান নির্মাণ করেছে, এখনও আমরা বনের মাঝে যানবাহন চলার রাস্তা, বাসযোগ্য ও ভ্রমণোপযোগী বাড়ি বানিয়েই চলেছি। এখন অন্যান্য পশুপাখিদের জায়গা যে মানুষ দখল করে নিচ্ছে এই বিষয়টি ততটা গুরুত্ব পায় না। কিন্তু ভূতযজ্ঞের মাধ্যমে শাস্ত্রকাররা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে বনে মানুষ আশ্রম গড়ে বাস করছে অথবা নগরী গড়ে তুলছে , সেখানে মানুষ ছাড়া অপরাপর পশু পাখির অধিকারও ততটাই। ক্ষুধার্ত পশু পাখির জন্য মানুষের ভাগ থেকে অন্ততঃ খাবারটুকু যেন নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তি হয় সেকারণেই ভূতযজ্ঞের অবতারণা। অরণ্যকাণ্ডের শুরুতেই যেখানে তপস্বীদের অগ্নিহোত্র গৃহসহ আশ্রমের উল্লেখ করেছি, সেখানেই বলা রয়েছে বহু হরিণ ও পাখি আশ্রয় নিয়েছে। দণ্ডকারণ্যের আরও গভীরে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে গিয়ে রাম

যখন বাসস্থানের জন্য মুনির কাছে প্রার্থনা জানান, মহর্ষি তাদের সেই আশ্রমেই থাকতে বলে এও জানান যে বহু হরিণের দল নিয়মিত সেখানে আসে। উহ্য থাকলেও বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে ঋষিদের থেকে খাদ্যের আশাতেই হরিণের দল নির্ভয়ে আশ্রমে যাতায়াত করতো। রামও সেকথা বুঝেই সবিনয়ে ঋষিকে প্রত্যাখ্যান করে জানান যে রাম কোনো হরিণকে শরবিদ্ধ করলে তা ঋষির সন্তাপের কারণ হবে, সেকারণেই রাম সে আশ্রমে থাকবেন না। ধনসম্পদের প্রাচুর্যসম্পন্ন রাজা অথবা অরণ্যে কুটিরবাসী ঋষি – সকলেরই যে সাধ্যমত ভূতযজ্ঞ সম্পাদনা করাটা নৈতিক কাজ, এই উদাহরণ থেকে সেটি স্পষ্ট হয়।

নৃযজ্ঞ মানুষের সেবা, কিন্তু কোন মানুষের? যারা কোনো তিথি না মেনেই চলে আসেন অর্থাৎ অতিথি, তাদের শ্রদ্ধাসহকারে যথাসাধ্য সেবাযত্ন করার নামই নৃযজ্ঞ। রামায়ণে প্রথমদিকের অতিথিসৎকারের নিদর্শন পাই যখন ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে অতিথি হয়ে আসেন। রাজা ঋষিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে কুশলজিজ্ঞাসার পর বলেন অমৃত প্রাপ্তি হলে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হলে, নিঃসন্তানের পুত্রলাভ হলে এবং হারানো বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হলে যেমন আনন্দ হয়, ঋষি বিশ্বামিত্র আতিথ্য গ্রহণ করায় রাজার ততোটাই আনন্দ হয়েছে। ঋষির সকল অভীষ্টই তিনি পূর্ণ করবেন। আবার বিশ্বামিত্র যখন রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে রাক্ষসবধের উদ্দেশ্যে বনে গমন করলেন, সেখানেও বিভিন্ন আশ্রমে মুনিরা তাঁদের অতিথিরূপে পেয়ে যথাসাধ্য সৎকার করলেন। নগরে যেমন রাজা আগত ঋষিকে অতিথিরূপে সাদরে সেবাযত্ন করবেন, একইভাবে অরণ্যে তপস্বীরাও রাজকুমারদের অতিথিরূপে যথাসামর্থ্য সেবা করবেন। অরণ্যকাণ্ডের ১২ সর্গে অগস্ত্যমুনি রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে অতিথিরূপে আসন ও ভোজন দিয়ে বলেছিলেন তপস্বীও যদি অতিথির উপযুক্ত সৎকার না করেন তাহলে তিনি নরকগামী হয়ে নিজেই নিজেই মাংসভক্ষণ করার শাস্তি পাবেন। যার যতটুকু সাধ্য তারমধ্যেই তিনি অতিথিসেবার দায়িত্ব পালন করবেন এটিই নৃযজ্ঞের মূল কথা।

রামায়ণে অতিথিসৎকারের তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এখানে আলোচ্য বলে মনে হয়েছে। প্রথমটি হল পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অযোধ্যা ত্যাগ করে বনের পথে এগিয়ে চলেছেন তখন নিষাদরাজ গুহ এবং ভরদ্বাজমুনি কর্তৃক তাদের আতিথ্য প্রদান করা। রাজ্যত্যাগী রামের রথ শৃঙ্গবেরপুরে এসে একটি গাছের তলায় সাময়িক আশ্রয় নিলে সেখানকার রাজা গুহ সবান্ধবে এসে রামকে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়াদি নানারকম খাবার, ভালো শয্যা, ঘোড়াদের খাবার এনে দিয়ে বলেন রামকে অতিথিরূপে পেয়ে তিনি এতটাই খুশি হয়েছেন যে রামকেই তিনি তাঁর রাজ্য অবধি অর্পণ করছেন। পরেরদিন গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে রাম এসে উপস্থিত হলে তিনি বন্য ফলমূল ,জল আদি তাঁর সাধ্যমতো খাবার দিয়ে অতিথিসৎকার করেন। এই ঘটনার পরবর্তী সময়ে ৮৪ সর্গে যখন রামের খোঁজে সবান্ধব ও সসৈন্য ভরত এসে শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হন তখন প্রথমে রামের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নিষাদরাজ এই আশঙ্কাই করেন যে ভরত তার রাজ্যলাভ নিষ্কন্টক করতে রামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছে। এই ভেবে তিনি একদিকে তাঁর জ্ঞাতিদের বর্মধারণ করে গঙ্গাতীরে পাহারায় থাকতে, বলবান ধীবরদের নদী রক্ষা করতে এবং বহু কৈবর্তযুবককে পাঁচশো নৌকায় সতর্ক হয়ে থাকার নির্দেশ দেন। অপরদিকে তিনিই আগত অতিথির জন্য মাছ, মাংস, মধু তথা সুরাদ্রব্য উপহার নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেন। রামের মতো একইভাবে ভরতকেও বলেন যে এই দেশ তোমারই গৃহোদ্যান, তুমি তোমার দাসের গৃহে বাস করো। এই কথাটি থেকেই আমরা আন্দাজ করতে পারি তখনকার সমাজে অতিথিপরায়ণতার গুরুত্ব কতখানি ছিল। আগত অতিথিকে সর্বাবস্থায় সেবাপ্রদান করা এবং বিনা নিমন্ত্রণে, অসময়েও তার উপস্থিতির জন্য নিজেকে সানন্দে প্রস্তুত রাখা -এই আদর্শটি আমরা রামায়ণে সবসময়েই দেখবো। ৯১

সর্গে ভরত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমের কাছাকাছি এসে সৈন্যদের একটু দূরে রেখে নিজে এই কথা ভেবে শুধু মন্ত্রীদের ও কূলপুরোহিত বশিষ্ঠকেই নিয়ে যান যে সকলে একসাথে উপস্থিত হলে আশ্রমের খাবার, জল, বৃক্ষাদি নষ্ট হবে। কিন্তু ভরদ্বাজমুনি ভরতের মনোভাব জেনে প্রীত হয়ে সে বিশাল সেনাবাহিনীসহ ভরতকে আতিথ্য গ্রহণের নিবেদন জানান। তারপরের ঘটনাটি অলৌকিক, কিন্তু খুবই আগ্রহজনক। ঋষি ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় দেবতা বিশ্বকর্মা, ইন্দ্রাদি তিন লোকপাল, নদীসমূহ, দিব্য বন, গন্ধর্ব-অপ্সরা প্রভৃতিকে মন্ত্রের মাধ্যমে আহ্বান করে প্রার্থনা করেন যে তিনি আতিথ্য করতে চান তাই দেবতারা যেন তার সুবন্দোবস্ত করেন। এরপর সেই সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর জন্য যে আতিথ্যের ব্যবস্থা হল সেটি অতুলনীয়। উৎকৃষ্ট খাদ্য, উত্তম শয্যা এবং যথোপযুক্ত বিনোদন – তিনটিরই প্রাচুর্যে যে সৈন্যদল রামের বিরহে কাতর হয়েছিল, তারা অবধি বলতে লাগলো যে তারা দন্ডকারণ্যেও এগিয়ে যাবে না অথবা অযোধ্যাতেও ফিরবে না। এই পুরো অংশটিই অলৌকিক, কাহিনীর প্রয়োজনে অন্যান্য অপার্থিব ঘটনার মতই এটির অবতারণা হয়েছে। কিন্তু অতিথিসৎকারের গুরুত্ব ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল এবং কাহিনীকার যে পাঠককে অবশ্যই এই নৃযজ্ঞে ব্রতী হওয়ার উপদেশ দিতে চেয়েছেন -তা সহজেই অনুমেয়।

এর পর অতিথিসৎকার প্রসঙ্গে আর যে দুটি উদাহরণ রামায়ণের নৈতিকতার পর্যালোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল মারীচ কর্তৃক রাবণের এবং সীতাকর্তৃক রাবণের অতিথিসৎকার। অরণ্যকাণ্ডের ৩৩ সর্গে রাক্ষস অমাত্য অকম্পনের কথায় প্রভাবিত হয়ে রাজা রাবণ রামের পত্নীহরণের উদ্দেশ্যে মারীচের শরণাপন্ন হন। রাক্ষস মারীচকেও দেখা যায় রাবণ আসায় যথাযথ ভাবে আগত অতিথিত সেবা করতে। মারীচ রাবণকে পাদ্য আসন এবং দুর্লভ ভোজন উপহার দিয়ে তারপর রাবণকে সদুপদেশ দেন। অতিথিসেবার মাহাত্ম্য এতটাই যে রাক্ষসজাতিকেও তার থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ সীতাহরণকালে রাবণ যখন সীতার কাছে উপস্থিত হন তখন কুটিরে রাম বা লক্ষ্মণ কেউ'ই নেই; উপরন্তু লক্ষ্মণ সীতার কথায় বাধ্য হয়ে রামের খোঁজে যাওয়ার সময় বারবার বিপদের আশঙ্কা করেছেন, বলেছেন যে তিনি নানা দুর্লক্ষণ দেখছেন। এর পরে রাবণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে ৪৬ সর্গ জুড়ে সীতার দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতেও সীতা তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। যেহেতু দ্বারে অতিথি আগত, তাই এত কিছুর পরেও সীতা রাবণকে আসন, পাদ্য এবং ভোজন দিয়ে যথাবিধি সংবর্ধনা করেন। রাবণের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের জীবনকাহিনী বিবৃত করেন, এমনকি যতক্ষণ না রাম-লক্ষ্মণ ফিরছেন ততক্ষণ রাবণ যেন বিশ্রাম নেন -একথাও সীতা বলেছেন। এই উদাহরণগুলি থেকে রামায়ণের অভিপ্রেত নৈতিকতার মধ্যে অতিথি-পরায়ণতা যে অন্যতম প্রধান একটি নীতি, সেটি আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মাদি তথা দৈনন্দিন জীবনে বেদবিহিত মাঙ্গলিক আচরণবিধির আলোচনায় ফিরে যাই। কোন কোন কাজকেগুলিকে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে, তথা কাহিনীর নায়ক বা অন্যান্যরা কোন আচরণ বারংবার করছেন সেগুলি তুলে ধরা যাক। বেদোক্ত নৈতিকতার ষোড়শ সংস্কার নিয়ে এর আগে আলোচনা হয়েছে, সেই ষোড়শ সংস্কারের অন্তিম কর্তব্যটি হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ আর 'অন্ত' হল শেষ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল মানবজীবনের শেষ যজ্ঞ যে যজ্ঞের আগুনে মৃত মানুষের দেহ আহুতি দেওয়া হয়। একজন জীবাত্মা সারাজীবন ভোগেকর্মে রত যে দেহটি পরিত্যাগ করলেন, সেই আত্মা পবিত্র পিতৃলোকে বা স্বর্গে যাওয়ার আগে সংসারে তার অন্তিম কর্তব্যটি অন্যের মাধ্যমে পালন করেন সেই দেহটিই অগ্নিসংযোগ দ্বারা পঞ্চভূতে বিলীন করে দিয়ে। রামায়ণে রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

অযোধ্যানগরে ভরত কর্তৃক যেমন যথাবিধি কৃত হয়, তেমনই দণ্ডকারণ্যে রাম'ও যথাসাধ্য পিতৃকার্য করেন। প্রথমটি স্বাভাবিকভাবেই যেমন বর্ণাঢ্য, দ্বিতীয়টিতে সেই আড়ম্বরের অবকাশ নেই। অযোধ্যায় দেখবো দশরথের দেহ মহা সমারোহে বহন করে সরযূনদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেই যাত্রাপথে সোনা রূপা ও বিভিন্ন রত্ন বিতরণ করা হয়েছে। ঋত্বিকেরা দশরথের দেহ চিতায় স্থাপিত করে আগুনে আহুতি দিলেন আর সামগায়কেরা সামগান করতে লাগলেন। দশদিনের অশৌচান্তে দ্বাদশদিনে ভরত দশরথের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনরত্ন, চাল-ডাল, পশু, দাসদাসী এবং বাসভবন দান করেন। রাজার জন্য রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে রাজ্যত্যাগী রাম দশরথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মন্দাকিনীর জলে নেমে দক্ষিণমুখী হয়ে শুধুমাত্র অঞ্জলিপূর্ণ জল নিবেদন করে তাতে পিতৃলোকগত পিতাকে তৃপ্ত হওয়ার প্রার্থনা করেন। তীরে উঠে এসে কুশের ওপর কুল মেশানো হিজলফলের পিন্ড দিয়ে বলেন যে এখন তাদের এই বস্তুই আহার্য, এতৎভিন্ন কিছু না থাকায় এরই পিন্ড পিতাকে নিবেদন করছেন। এরপরেই দেখবো কৌশল্যা আফসোস করে সুমিত্রাকে বলছেন যে সসাগরা পৃথিবীর যিনি ভোগ করেছেন সেই রাজা দশরথ কীকরে হিজলপিন্ড গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ সেটি এতই নিম্নমানের ভোজ্য যে রাজার অনুপযুক্ত। দুই রকমের দুটি অন্ত্যেষ্টির ব্যাখ্যান করে বোধহয় রচনাকার এটাই বোঝাতে চেয়েচেন যে অবস্থা এবং সামর্থ্য যা'ই হোক না কেন, অন্তিম সংস্কারটি অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য মানুষ নিজে নিজের প্রতি করে না, অন্যরা তার উদ্দেশ্যে করে। যদি অন্যদের সাধ্যে শুধুমাত্র জলটুকুই দেয় হয় তাহলে তাই হোক, কিন্তু এই কর্তব্যে চ্যুতি যেন না হয়। শুধু কি মানুষের অন্ত্যেষ্টির কথা'ই উঠে এসেছে? এসেছে রামের অনুগত, পিতৃবন্ধু জটায়ু পাখির অন্তিম সংস্কারের কথাও। সীতাকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে জটায়ু অপেক্ষা করছিলেন রামের জন্যই, মরণাপন্ন অবস্থায় যৎসামান্য তথ্য দিয়েই প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ কাঠ এনে দিলে রাম নিজে জটায়ুর চিতা প্রস্তুত করে দাহ করেন। জটায়ু বিশালাকৃতির গৃধ অর্থাৎ শকুন জাতীয় পাখি, তাই তার প্রতি রাম লক্ষ্মণ হরিণের মাংসের পিণ্ড অর্পণ করে অন্যান্য সব পাখিদের ভোজন করালেন এবং তারপরে দুইভাই গোদাবরী নদীতে গিয়ে যথাবিধি জল দিয়ে তর্পণ সম্পন্ন করলেন। এই মহাকাব্যটির ছত্রে ছত্রে আমরা দেখবো কোথাও কবন্ধ রাক্ষসকে বধ করে রাম তারও যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করলে তিনি শাপমুক্ত হয়ে দনু পরিচয়ে দিব্যপুরুষের রূপ পরিগ্রহ করেন, যথাবিধি অন্তেষ্টির জন্য প্রার্থনা জানায় নরখাদক বিরাধ রাক্ষসও, কোথাও বা ব্রহ্মজ্ঞ তপস্বী শরভঙ্গ বয়সকালে মন্ত্রোচ্চারণ করে নিজেই নিজের দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হন। জীবনের শেষ সময়েও তার কর্তব্য কী সেকথা রামায়ণকার এভাবেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের জীবনে যেকোনো কার্য শুরুর আগে দেবতার আশীর্বাদ কামনাও রামায়নে কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। দশরথ যখন স্থির করেন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন তখন তার নির্বিঘ্ন সম্পাদনার জন্য আগে হোমযজ্ঞাদি ও অন্যান্য মঙ্গলাচরণের ব্যবস্থা করা হয়। কুলপুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে সস্ত্রীক রাম উপবাস সংকল্প করে হোম সম্পন্ন করেন হবিঃশেষ গ্রহণ করেন এবং সারারাত কুশশয্যায় শয়ন করেন। অন্যদিকে বনবাসকালীন রাম যখন স্থির করেন বনের কোনো স্থানে অস্থায়ী কুটির নির্মাণ করবেন, সেখানেও আগে ব্যবস্থা হয় যথাশাস্ত্র বাস্তুশান্তি অনুষ্ঠানের। প্রথমবার চিত্রকূট পর্বতের সমভূমি অংশে আর দ্বিতীয়বার দণ্ডকারণ্যে আমরা দেখি রাম লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিচ্ছেন বাস্তুশান্তির জন্য হোমের ব্যবস্থা করতে। প্রথমবার লক্ষ্মণ হরিণ বধ করে এনে দিলেও দ্বিতীয়বার দেখি পুষ্পবলি দিয়েই বাস্তুপুরুষকে তৃপ্ত করা হয়েছে। সেই একই মানসিকতার পরিচয় পাই এখানেও, যে সামর্থ্য যা'ই হোক

কর্তব্যে অনড় অটুট থাকাটাই পরম ধর্ম। রাম যথাবিধি মন্ত্রপাঠ হোম ও দেবার্চনা করে তারপরেই পর্ণকুটিরে প্রবেশ করেন। যৌবরাজ্যে অভিষেক হোক অথবা জঙ্গলের গভীরে মাটির বাড়ি, রামায়ণের নায়ক ধর্মপালনে বিরত হন নি।

অরণ্যচারী ঋষিগণ, রাজা দশরথ বা রামায়ণের নায়ক ধর্মাত্মা রাম বেদবিহিত হোম-যজ্ঞাদির আচরণ তো করেছেনই, কিন্তু যজ্ঞ তথা দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান তৎকালীন সমাজে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার আরও প্রমাণ পাবো মহাকাব্যের খলনায়ক রাবণ রাজার সোনার লংকায়। পরস্ত্রীহরণের পাপে সোনার লংকা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এই আশঙ্কা রাজাকে জানাতে গিয়ে বিভীষণ বলেছেন সীতা আসার পর থেকেই নানারকম দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেই নানা দুর্লক্ষণের অন্যতম প্রধান হল হোমের অগ্নি যথাযথ প্রজ্জ্বলিত হয় না, শুধু ধোঁয়া আর স্ফূলিঙ্গ দেখা যায়; হোমগৃহ, ব্রহ্মস্থলী এবং হব্য দ্রব্যে পিঁপড়ে সরীসৃপের আনাগোনা। পাঠকের মনে যেন এই সংশয় না থাকে যে রাক্ষসরাজ বলেই তিনি হোম-যজ্ঞের মত নিত্যবিহিত কর্তব্য থেকে মুক্ত। হোম তথা ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক দৈবিক শক্তির প্রতি আস্থাজ্ঞাপন, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, প্রার্থনা প্রত্যেকেরই নিয়মিত আচরণীয়; যিনি অন্যত্রও অধর্মে লিপ্ত হবেন -এই পবিত্র হোম যজ্ঞ তিনি সম্পন্ন করতে পারবেন না। হোমের মাহাত্ম্য আরও দেখবো যেখানে অরণ্যচারী রামের কাছে বৈখানস, বালখিল্য সংপ্রক্ষাল প্রমুখ ঋষিরা আবেদন জানান অরণ্যে বসবাসকারী বানপ্রস্থী ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতে। এই বানপ্রস্থীরা রাক্ষসের হাতে নিহত হচ্ছেন এবং ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য তাদের রক্ষা করা, একথা মনে করিয়ে দিয়ে ঋষিরা বলছেন রাম ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান, রাজবংশীয় এবং রাজারা প্রজাদের থেকে কর নিয়ে তাদের প্রতিপালন করে থাকেন। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছোনো ফলমূলাহারী বানপ্রস্থী মুনিগণ হোম-যজ্ঞাদির ফলে যে পুণ্য অর্জন করেন সেই পুণ্যের চতুর্থভাগ প্রজাপালক রাজার প্রাপ্য; যেহেতু সেই কর তথা পুণ্যফল রামের কূল ভোগ করছে অতএব তাদের রক্ষা করাও রামের কর্তব্য। এই কথোপকথন থেকে বোঝা যায় যে ফলন হওয়া শস্যের মতো বা উপার্জিত অর্থের মতো তপস্যালব্ধ যে পুণ্যফল তাকেও রাজা সাদরে গ্রহণ করবেন। পার্থিব কাম্য বস্তুর যথাযথ প্রাপ্তি ও নির্বিঘ্ন ভোগের জন্যই তপস্যা হোমাদিকে জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অধ্যায়রূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় নৈতিক দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে রামায়ণ এবং মহাভারত দুটি মহাকাব্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শুধু তত্ত্বকথা নয় -কাহিনীর মাধ্যমে উদাহরণের সাহায্যে যেভাবে নৈতিক কর্তব্য অকর্তব্যগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে খুব সহজেই জনসাধারণের মনে নীতি, আদর্শ, পালনীয় ধর্ম প্রভৃতি বিষয়গুলি গেঁথে যায়। রামায়ণের নৈতিকতার ব্যাপ্তি এতটাই যে এক একটি চরিত্রকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। বর্ণাশ্রম ধর্ম, পুত্রের কর্তব্য, স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পালনীয় কর্তব্য, ধর্মযুদ্ধের নীতি, রাজধর্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তৎকালীন সময়ে নৈতিকতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে অথবা রামায়ণের কোন বিশেষ নীতি আজও জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে -এইধরনের অনেক আলোচনা করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র রামায়ণের সমাজে বেদবিহিত কর্মের গুরুত্ব ও তার পালনেরই পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১) বসু রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ),অষ্টম মুদ্রণ, শমিত সরকার, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।

২)তর্করত্ন শ্রীপঞ্চানন, রামায়ণম্ শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্ (সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত),চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক মেশিন প্রেস, কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৩)ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।